লোক প্রশাসন সাময়িকী
৮ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ

মুহাম্মদ আবদুল কাদের *

১.০ ভূমিকা

১.১ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ প্রসঙ্গে আলোচনার আগে "স্থানীয় সরকার" বলতে কি বুঝায় সে সমন্ধে ধারণা নেয়া প্রয়োজন। স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা যা স্থানীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য গঠিত হয়ে থাকে তাকে সাধারণত স্থানীয় সরকার বলা হয়। স্থানীয় সরকারের কোন সার্বভৌম শক্তি না থাকায় স্থানীয় সরকারের গঠন, কার্য পরিধি ও আর্থিক ক্ষমতা বিভিন্ন আইন, বিধি, সার্কুলারের মাধ্যমে জাতীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাত্ত্বিকগণ আকার, কাঠামো, সীমাবদ্ধতা কিংবা ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে স্থানীয় সরকার প্রত্যয়টি সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৪০ এর দশকে জি মন্টাগো মরিস স্থানীয় সরকার এর দু'ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রথমত, স্থানীয় সরকার হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সংস্থাসমূহ যারা সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং দায়িত্বাবলীর জন্য জাতীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সরকার কোন এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত সরকার। এই স্থানীয় সরকারসমূহ জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকার কিছু কিছু ক্ষমতা বা দায়িত্বাবলী পায় যা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে এসব প্রতিষ্ঠান কার্যকর করতে পারে। মন্টাগো মরিসের মতে যদিও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের এখতিয়ার এবং দায়িত্বাবলীর তারতম্য রয়েছে তবুও পদ্ধতি দু'টি মোটামুটি পাশাপাশিভাবে চালু রয়েছে।

১.২ চার্লস ব্যরই বলেছেন, স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝায়; যাদের দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে। দায়িত্বাবলী পালনের নিমিত্তে নিজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে স্থানীয় সরকার কর ধার্য করতে পারে। যদিও জাতীয় সরকার জনস্বার্থে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করে তবুও তারা জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে কাজ করে বা জাতীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। এন সাইক্লোপেডিয়া অব স্যোশ্যাল সায়েন্সের নয় ও দশ নম্বর ভলিউমে উইলিয়াম এ রফসন স্থানীয় সরকারকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

"স্থানীয় সরকার বলতে একটি ভূখন্ডগত অসার্বভৌম সম্প্রদায়কে বুঝায়, যাদের নিজস্ব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারীর মত প্রয়োজনীয় আইনগত অধিকার সংগঠন আছে।" জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী "স্থানীয় সরকার হলো একটা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উপ-বিভাগ, যা আইন দ্বারা গঠিত হয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমুদয় কার্যক্রমে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষমতা, বিশেষভাবে কর ধার্য করার ক্ষমতা রাখে"।

১.৩ এ আলোচনায় স্থানীয় সরকারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিভাত ঃ

(১) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা বৈধ কর্তৃত্বের অধীন;

(২) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো স্থানীয় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার জন্য গঠিত একটি সংস্থা;

(৩) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো কর ধার্যকরণ ও প্রশাসন পরিচালার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত একটি সংগঠন যার নিজস্ব কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনা করার অধিকার থাকে;

(৪) এ সরকার প্রকৃতভাবে জাতীয় সরকারের নিকট দায়বদ্ধ এবং অধীনস্থ।

২.০ পটভূমি

২.১ প্রাচীনকালে এদেশে বর্ণ বা গোত্র ভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত হয় বলে মনে করা হয়। তবে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও পঞ্চায়েত গঠিত হতো। গ্রামের ভূস্বামী বা কৃষকের সাথে ভৃত্যের বিবাদ মিটানোর জন্য পঞ্চায়েত গঠিত হওয়ার কথা জানা যায়। তবে পূর্ব ভারতে বর্ণপ্রথা শিথিল থাকার কারণে এবং এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের কবলে প্রায়ই পতিত হতো বলে এখানে দূর্বল ধরনের গ্রামীন শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

২.২ মধ্যযুগে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থানের পরে নতুন নতুন ধরনের ও সুসংবদ্ধ শাসন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। মুগলরা 'সুবা' এবং 'সরকার' এই দুই ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করে। সুবার পরিচালক কর্তাকে সুবাদার এবং সরকারের কর্তাকে সিকদার বলা হতো। এ সময় প্রশাসনিক ইউনিটকে পরগণা হিসেবে চিহ্নিত করে সুসংগঠিত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। পরগণায় সুসংবদ্ধ শাসন কার্য পরিচালনার লক্ষ্যে ফৌজদার, কাজী এবং মীরডাল নিয়োগ করা হয়। গ্রামে গ্রামে গ্রাম প্রধান এবং চৌকিদার নিয়োগ করা হয়। মুঘল শাসনামলে গ্রামীন প্রশাসনের পাশাপাশি কোতোয়াল নিয়োগ করে মিউনিসিপ্যাল ও প্রশাসনিক কার্যাদি যৌথভাবে সম্পন্ন করা হতো। প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একজন মীর মহল্লাহ থাকতেন। কাজী নিয়োজিত হতেন বিচার কাজের জন্য। বিনামূল্যে খাদ্য ও আশ্রয় দেবার জন্য প্রতিটি শহরে "খানকাহ্" এর ব্যবস্থা ছিল।

২.২ বাংলাদেশের আধুনিক পদ্ধতির স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামোগত বিকাশ শুরু হয়েছে বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত কতিপয় আইনের মাধ্যমে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে শহরাঞ্চলে এবং উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে পল্লী অঞ্চলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামোগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বর্তমান যে কাঠামো বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত হয় তা ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে সূচিত হয়ে বর্তমানকালে প্রণীত বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। নিচে কালানুক্রমিক সংশ্লিষ্ট আইনগুলো আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ক্রমবিকাশের ধারাটি তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

২.৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

বৃটিশরা এদেশে আগমনের পরে প্রচলিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৭৯৩ সনে লর্ড কর্ণ ওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন পাশ হওয়ার পরে এদেশে জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয় এবং রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করাসহ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বও তাদের উপর অর্পিত হয়।

২.৪ গ্রাম চৌকিদারী আইন-১৮৭০

লর্ড মেয়ো এর আমলে গ্রাম চৌকিদারী আইন ১৮৭৯ পাশ হয়। এ আইন অনুযায়ী পাঁচজন সদস্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মনোনয়ন লাভের মাধ্যমে পঞ্চায়েত গঠন করতেন। একটি পঞ্চায়েত কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ট্যাক্স আদায় করে তা দিয়ে চৌকিদারের বেতন পরিশোধ হতো। সর্বনিম্ন ট্যাক্সের হার ছিল ছয় আনা। যদি কোন পঞ্চায়েত সদস্য তার এলাকার সংশ্লিষ্ট একজন চৌকিদারের বেতন পরিশোধ করতে ব্যর্থ হতেন তবে তার সম্পত্তি ক্রোক করে চৌকিদারের বেতন পরিশোধ করার বিধান ছিল। পঞ্চায়েত তিন বছরের জন্য নিযুক্ত হতেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক। নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তি পঞ্চায়েত সদস্য পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হতো। এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি বিদ্যমান ছিল ঃ

ক) পঞ্চায়েতের সদস্যরা নির্বাচিত প্রতিনিধি নন বরং তারা ছিলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা মনোনীত। ফলে তারা একদিকে যেমন জনগণের নিকট ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিলেন না তেমনি তারা জন কল্যাণের প্রতি ততটা মনোযোগীও ছিলেন না।

খ) তারা কোন রকম জন কল্যাণমূলক অথবা উন্নয়মূলক কার্যক্রম সরাসরি গ্রহণ করতে পারতেন না।

গ) ট্যাক্স আদায়ের মাধ্যমে তহবিল সৃষ্টি তথা ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পঞ্চায়েত সদস্যগণ তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারতেন না।

ঘ) অনেক সময় চৌকিদাররা নিয়মিত বেতন পেতেন না।

ঙ) নিরাপত্তা এবং কর সংগ্রহের নামে জনগণ তাদের পঞ্চায়েতের জুলুম এবং হয়রানীর শিকার হন।

২.৫ বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন আইন -১৮৮৫

স্থানীয় পর্যায়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লর্ড রিপোন কর্তৃক ১৮৮২ সালে উপস্থাপিত রেজুলেশনটি সংশোধিত রূপে ১৮৮৫ সালে বংগীয় স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন আইন হিসেবে পাশ হয়। এ আইনে প্রতিনিধিত্বের বিধান রেখে নিম্নলিখিত তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার পদ্ধতি চালু করা হয় ঃ

১। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি (পাশাপাশি চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু ছিল)

২। মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড

৩। জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড

২৫.৯০ বর্গ কিলোমিটার হতে ৩৮.৮৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হতো। এ কমিটির আওতায় এক বা একাধিক গ্রাম থাকতো। ৫ থেকে ৯জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে দু'বছরের জন্য প্রথমবারের মত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক এ কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির সদস্যরা জেলা বোর্ডের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। এ কমিটিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে কিছুটা সংশ্লিষ্ট করা হয়। তাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও কর আদায় ছাড়াও গ্রামের সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, জন্ম মৃত্যুর হিসেব রাখা এবং লোকাল বোর্ডের প্রত্যর্পিত কিছু বিষয় দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কমপক্ষে ছয়জন সদস্য নিয়ে লোকাল বোর্ড গঠন করা হতো। লোকাল বোর্ডের নির্বাচিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর এর অনুমোদন সাপেক্ষে। সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতেন। এ বোর্ড এর অধীনে অধীনস্থ ইউনিয়ন কমিটিগুলির নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল লোকাল বোর্ডের অন্যতম কাজ। জেলা বোর্ড কমপক্ষে নয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। জেলা বোর্ডের সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে নির্বাচিত হতেন তবে প্রাদেশিক সরকার সরাসরিভাবে চেয়ারম্যান নিয়োগ করতো না। জেলা বোর্ড সরকারী সড়ক, হাসপাতাল, স্কুল ও সরকারী ভবন নির্মাণ, পানি সরবরাহ এবং দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের মত সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতো।

এই আইনের উল্লেখযোগ্য ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। এ আইনে জেলা বোর্ডকে অনেক বেশী ক্ষমতা দেয়া হয়।

২। ইউনিয়ন বোর্ড ও লোকাল বোর্ড অনেক ব্যাপারেই জেলা বোর্ডের উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে স্বাধীনভাবে এ সকল প্রতিষ্ঠান বিকাশ লাভ করতে পারেনি।

৩। জেলা বোর্ডের আয়ের উৎস অত্যন্ত সীমিত থাকায় নিম্ন পর্যায়ের সংস্থাগুলিকে জেলা বোর্ড অর্থ সাহায্য দিতে পারতো না।

২.৬ বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্ত্বশাসন আইন-১৯১৯

এ আইন অনুযায়ী ইউনিয়নকে অর্থ সংগ্রহ করার কার্যকর ক্ষমতা এবং অধিকতর স্বাধীনভাবে দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা করার ক্ষমতা দেয়া হয়। এই আইনটি প্রবর্তন দ্বারা ১৮৭০ সালে প্রবর্তিত চৌকিদারী-পঞ্চায়েত এবং ১৮৮৫ সালে প্রবর্তিত ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন বোর্ডের নামে একমাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যকাল তিন বছর রাখা হয়েছিল, যা ১৯৩৬ সালে চার বছর করা হয়। পূর্বে প্রবর্তিত মহকুমা বোর্ড এবং জেলা বোর্ড ব্যবস্থা এই আইন বলে বহাল রাখা হয়। এই আইনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ঃ

ক. মোট ৬ থেকে ৯ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হতো। এক তৃতীয়াংশ সদস্য হতেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। এই সদস্যদের মধ্য হতেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন। মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্য ধার্য করার প্রথা ১৯৪৬ সালে রহিত করা হয়।

খ. ইউনিয়ন বোর্ডের বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য ইউনিয়ন বেঞ্চ ও কোর্টের বিধান রাখা হয়েছিল।

গ. যে সব পুরুষ ২১ বছরের বেশী বয়স্ক এবং যাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল তাদের প্রকাশ্য ভোটের মাধ্যমে ইউনিয়ন অফিসারের উপস্থিতিতে প্রার্থীদের মধ্য থেকে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের নাম উচ্চারণ করে ভোট কার্য সমাধা করা হতো।

ঘ. ইউনিয়ন বোর্ডকে ট্যাক্স আরোপ ও ছোট খাটো ফৌজদারী অভিযোগ নিস্পত্তির ক্ষমতা দেয়া হয়। রাস্তাঘাট, পুল, নিরাপত্তা, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সুবিধা, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং জেলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ডকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সরবরাহ করা ছিল এই কমিটির প্রধান কাজ।

ঙ. ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য তদারক ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব উন্নয়ন সার্কেল অফিসারের উপর ন্যাস্ত ছিল।

এদিকে এই আইন বলে যে লোকাল বোর্ডের বিধান রাখা হয় তা নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের দ্বারা গঠিত হতো। ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের সাথে সমন্বয় সাধনের সেতুবন্ধন হিসেবে এই লোকাল বোর্ড কাজ করতো। তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না থাকায় পরবর্তীকালে লোকাল বোর্ডের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এই আইনে যে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়েছিল তার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হতেন। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। তাছাড়া একজন, কোন কোন ক্ষেত্রে দুইজন ভাইস চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হতেন। যে সব পুরুষের বয়স ২১ বছরের বেশী ও যাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল তারাই জেলা বোর্ডের সদস্য মনোনয়নের জন্য ভোটাধিকার প্রাপ্ত ছিলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ, জন্মমৃত্যু রেজিষ্ট্রিকরণ, পল্লী দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও ডাক বাংলো সংরক্ষণ ছিল জেলা বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কাজ।

ইউনিয়ন বোর্ড যে সব সমালোচনার সম্মুখীন হয় তার মধ্যে রয়েছে সংরক্ষিত ভোটাধিকার প্রক্রিয়া, প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি ও জেলা পরিষদের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা।

৩.০ পাকিস্তান আমল

৩.১ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে ভারতের স্বাধীনতার দাবী জোরদার হতে থাকে। ফলে বৃটিশরা ভারতবর্ষকে পাকিস্তান ও ভারত নামক দু'টি দেশে বিভক্ত করে ১৯৪৭ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে।

৩.২ মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ-১৯৫৯

পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান অধিষ্ঠিত হয়ে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ-১৯৫৯ জারী করেন। এ আদেশ বলে মূলত ৪ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। যেমন ঃ

১. ইউনিয়ন কাউন্সিল

২. থানা কাউন্সিল

৩. জেলা কাউন্সিল

৪. বিভাগীয় কাউন্সিল

এ সময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের গঠন, কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বেশ পরিবর্তন ঘটে। এ আদেশ বলে গঠিত ইউনিয়ন পরিষদের বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. গড়ে দশ হাজার লোকবসতি সম্পন্ন এলাকা নিয়ে ১০ থেকে ১৫জন সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত হয়। মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হতেন এবং এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মনোনীত হতেন।

২. এই সদস্যদের ভোটে তাদের মধ্য থেকেই ১জন চেয়ারম্যান ও ১ জন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন।

৩. ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের জন্য সম্মানীর ব্যবস্থা করা হয় প্রথম বারের মতো।

৪. ইউনিয়ন কাউন্সিলকে মোট ৩৭টি কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। এর মধ্যে পৌর কার্যাবলী, পুলিশ ও প্রতিরক্ষা, রাজস্ব ও সাধারণ প্রশাসন এবং বিচার কার্যাদি, শিক্ষা, যোগাযোগ, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ইউনিয়ন কাউন্সিল জাতীয় পূনর্গঠন, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কার্যাদিও সম্পাদন করতো। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক ও বিবাহ আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদেরকে বিচার করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল।

৫. ইউনিয়ন কাউন্সিলকে তহবিল গঠনের জন্য সম্পত্তির উপরে কর, চৌকিদারী রেট ও অন্যান্য করারোপের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এছাড়া পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ করার জন্য সরকার থেকে আর্থিক অনুদান দেয়া হয়।

৩.৩ একটি থানার আওতায় সকল ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের সদস্য থাকতেন। থানা পর্যায়ে কর্মরত কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস এবং সমবায় বিভাগের কর্মকর্তাগণ পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য হতেন। মহকুমা প্রশাসক বা এসডিও পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের সভাপতি এবং সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) সহ-সভাপতি হতেন। থানা-কাউন্সিল মূলত সমন্বয়কারীর ভূমিকাই পালন করতো। তার কর ধার্য করার তেমন কোন ক্ষমতা ছিল না।

৩.৪ জেলা কাউন্সিল সরকারী ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হতো। জেলা কাউন্সিলের ৫০% সদস্য ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। বাকী ৫০% সদস্য হতেন পদাধিকার বলে জেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাগণ। জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান থাকতেন। তবে ১৯৬৩ সালে নির্বাচিত (বেসরকারী) প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান করা হয়। সড়ক, ভবনাদি, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী, স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী, নলকূপ, ডাক-বাংলোর সংরক্ষণ এবং জেলার অন্তর্গত স্থানীয় পরিষদসমূহের কর্মতৎপরতার সমন্বয় সাধন করা ছিল জেলা কাউন্সিলের অন্যতম কাজ।

৩.৫ কোন বিভাগের প্রশাসনিক এলাকার পরিধির মধ্যে বিভাগীয় কাউন্সিল গঠিত হতো। বিভাগীয় কাউন্সিলের ৫০% সদস্য বিভিন্ন সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ হতেন। আর বাকী ৫০% সদস্য বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি এবং বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হতেন। বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, স্থানীয় পরিষদসমূহ এবং মিউনিসিপ্যাল সংস্থার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা ছিল বিভাগীয় পরিষদ এর মূল কাজ।

৩.৬ মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে স্থানীয় আইনের আওতায় স্থানীয় সংস্থাগুলিকে অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ/ক্ষমতা দেয়া হয়। এই ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাদেরকে আরো বেশী মাত্রায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত করা হয় তাদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। তবে প্রতিটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় চেয়ারম্যান পদে সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে মনোনীত হওয়ায় স্বশাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উন্নয়ন ও বিকাশের ধারা ব্যাহত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন রকমের দূর্নীতি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব তথা সদস্যগণ প্রেসিডেন্টকে পরোক্ষভাবে নির্বাচিতকরণের জন্য ইলেকটোরাল কলেজ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য সরকারী এজেন্ট হিসেবে কাজ করা; আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া বা ব্যয় করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অভাব থাকায় এ ব্যবস্থায় জনগণের অংশ গ্রহণের সাফল্য ব্যাহত হয়। অনেক ক্ষেত্রে তা স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ বাড়িয়ে দেয়। মৌলিক গণতন্ত্র ধনী জোতদার, মহাজন ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণের একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় (সোবহান ১৯৭৮)। তা স্বত্বেও এলিয়ট টেপার (১৯৭৬) মনে করেন কেন্দ্র থেকে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এই মৌলিক গণতন্ত্র।

৪.০ বাংলাদেশ আমল

৪.১ বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকারিতা আনয়নের জন্য কিছু আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হওয়ায় এবং এদেশের কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/পার্লামেন্ট না থাকায় রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-৭ (পি, ও, নং-৭) জারীর মাধ্যমে পূর্বের প্রচলিত মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে সৃষ্ট সবকয়টি সংস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশের তৃণমূল প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম বদল করে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত রাখা হয়। থানা কাউন্সিলের নাম বদল করে থানা উন্নয়ন কমিটি রাখা হয় এবং জেলা কাউন্সিলের নাম বদল করে জেলা বোর্ড রাখা হয়।

৪.২ রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২২-১৯৭৩

এ আদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ নামকরণ করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্তির মাধ্যমে ৩ জন

করে মোট ৯ জন সদস্য নির্বাচনের বিধান করা হয়। সমগ্র ইউনিয়নের জন্য একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের বিধান রাখা হয়।

৪.৩ স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ -১৯৭৬

১৯৭৬ সালের ২২শে নভেম্বর স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারী হয়। এ অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পর্যায়ে থানা পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ এই তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠন করা হয়। যদিও এই অধ্যাদেশ বলে ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের অনুরূপ রাখা হয় তবুও এই অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের উল্লেখযোগ্য যে সব পরিবর্তন ঘটে তা হলো ঃ

(১) ভাইস চেয়ারম্যানের পদটি রহিত করে দেয়া হয় (২) একজন চেয়ারম্যান ও ৯ জন সদস্য সরাসরি ১৮ বছর বয়স্ক ব্যক্তি (ভোটার) গণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান (৩) দু'জন মনোনীত মহিলা সদস্য এবং দু'জন মনোনীত (কৃষক প্রতিনিধি) ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ভুক্তির বিধান (৪) ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর করা হয় (৫) এ অধ্যাদেশ বলে ইউনিয়ন পরিষদকে মোট ৪০টি কাজের ভার দেয়া হয়। সমস্ত কার্যাবলীকে প্রধান চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমনঃ (১) পৌর কার্যাবলী (২) রাজস্ব প্রশাসন কার্যাবলী (৩) নিরাপত্তা কার্যাবলী (৪) উন্নয়নমূলক কার্যাবলী।

তাছাড়া ১৯৭৬ সালের জারীকৃত ভিলেজ কোর্ট অর্ডিন্যান্স বলে ইউনিয়ন পরিষদকে বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তাছাড়া জাতীয়তা প্রত্যয়নপত্র, চরিত্রগত প্রত্যয়ন পত্র, আয় প্রত্যয়ন পত্র প্রদান এবং আদম শুমারীর কাজে সহায়তা করা ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম কাজ ছিল।

এ অধ্যাদেশের বলে থানা পরিষদ সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠনের বিধান রাখা, মহকুমা প্রশাসককে থানা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট থানা সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) কে থানা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নিয়ুক্তির বিধান রাখা হয়। থানা পরিষদ নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদন করতো ঃ

১. ইউনিয়ন পরিষদসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে থানা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ইউনিয়ন পরিষদগুলির কর্মকান্ডে সহযোগিতা ও উৎসাহ দান;

২. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩. থানা পরিষদ এলাকায় সমুদয় কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন।

এই আদেশ অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারী এবং মনোনীত মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হতো। নির্বাচিত এবং মনোনীত সদস্যদের মোট সংখ্যক

সদস্যের কমপক্ষে এক দশমাংশ মহিলা সদস্যের মনোনয়ন দেয়ার নিয়ম ছিল। নির্বাচিত এবং মহিলা সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। নির্বাচিত সদস্যদের প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে এ অধ্যাদেশ জারী হওয়ার পরে জেলা পরিষদের কোন নির্বাচন দীর্ঘদিন অনুষ্ঠিত হয়নি। জেলা পরিষদের দায়িত্ব ছিল পাঠাগার, হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী, সরকারী সড়ক, কালভার্ট, পুল, সরকারী বাগান, খেলার মাঠ, ডাকবাংলো ইত্যাদি নির্মাণ, সংরক্ষণ/সংস্কার করা। তাছাড়া স্বেচ্ছায় কল্যাণমূলক কাজ, সাংস্কৃতিক, জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত ও অন্যান্য কার্যাবলী জেলা পরিষদ সম্পাদন করতে পারতো।

এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী থানা পরিষদ থাকা সত্ত্বেও থানা উন্নয়ন কমিটি নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করা হয়। যাতে থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ সদস্য হিসাবে থাকতেন। থানা উন্নয়ন কমিটির সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন চেয়ারম্যান, একজন সেক্রেটারী ও একজনকে ক্যাশিয়ার নিয়োগ করা হতো। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের এবং বাস্তবায়নের সাধারণ দায়িত্ব এ কমিটি পালন করে থাকে।

৪.৪ স্বনির্ভর গ্রাম সরকার

১৯৭৬ সালে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের বিধিমালায় কিছু পরিবর্তন করে ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রবর্তন করা হয়। একজন গ্রাম প্রধান ও দু'জন মহিলাসহ মোট এগারজন সদস্য নিয়ে গ্রাম সরকার গঠনের বিধান রাখা হয়। গ্রাম প্রধান এ সদস্যদের মধ্যে থেকে একজনকে সচিব নিয়োগ করতেন। স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের কার্য পরিধি ছিলো নিম্নরূপ :

১। খাদ্য উৎপাদন

২। নিরক্ষরতা দূরীকরণ

৩। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা

৪। আইন শৃঙ্খলা

কিন্তু এ ব্যবস্থাটি বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি। ১৯৮২ সালে এ ব্যবস্থা বাতিল ঘোষিত হয়।

৫.০ স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ- ১৯৮২

৫.১ ১৯৮২ সালের ৭ই নভেম্বর থেকে কার্যকর এই অধ্যাদেশ বলে প্রথমে উন্নত থানা পরিষদ গঠন করা হয় এবং থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীতে উন্নীত থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদে রূপান্তরিত করা হয়।

থানা পর্যায়ে সমস্ত কার্যাবলীকে মূলত ক) সংরক্ষিত ও খ) হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ-এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। দশটি বিষয় অর্থাৎ কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং সেচ ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন, ত্রাণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন, সমবায় ভিত্তিক কর্মসূচী সম্প্রসারণ, পশুপালন ও মৎস চাষ এরূপ দশটি বিষয় হস্তান্তরিত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার, রাজস্ব প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, বৃহৎ শিল্প, খনন কার্য, এবং খনিজ সম্পদের উন্নয়ন সহ তেরটি দায়িত্ব সংরক্ষিত রাখা হয়। একটি থানায় বসবাসকারী প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। উপজেলা আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে থাকতেন। উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে প্রায় বিশজন প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাকে উপজেলায় পোষ্টিং দেয়া হয়েছিল। সকল কর্মকতা উপজেলা পরিষদে থাকতেন। তিনজন মহিলা সদস্য উপজেলার অধিবাসীদের মধ্য থেকে সদস্য হতেন। একজন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। যিনি উপজেলা পরিষদের সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতেন, কর ইত্যাদি আরোপ করা সহ ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদনের সার্বিক দায়িত্ব উপজেলা পরিষদে অর্পণ করা হয়।

উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মুনসেফ উপজেলায় বদলী করে তাদের উপজেলাধীন ফৌজদারী এবং দেওয়ানী বিচার করার এখতিয়ার দেওয়া হয়। তবে এই অধ্যাদেশটি ১৯৯১ সালে বাতিল (রিপিল) করা হয়।

৬.০ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ-১৯৮৩

১৯৮৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এ অধ্যাদেশটি জারী করে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য তিনজন করে মোট ৯ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। এছাড়া প্রতি ওয়ার্ড থেকে ১ জন মহিলা সদস্য মনোনীত করা হয়-যারা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হবে। ১৯৮৮ সালের ৩০শে আগষ্ট সরকার এক সংশোধনীর মাধ্যমে জেলা প্রশাসনকে ইউনিয়ন পরিষদ মহিলা সদস্য মনোনয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে। ১৯৮৯ সালের ৯ই এপ্রিল পুনরায় এক সংশোধনীর মাধ্যমে বলা হয় যে, সরকার ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের মনোনয়ন দেবে। ইউনিয়ন পরিষদকে পৌর, রাজস্ব ও প্রশাসন এবং নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কাজসমূহ সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস ২৮টি থেকে কমিয়ে ৫টিতে সীমাবদ্ধ করা হয়। এগুলো হলো ঃ ১। বাড়ী ও দালান কোঠার উপর কর ২। গ্রাম্য পুলিশ রেট ৩। জন্ম, বিবাহ ও ভোজ্যের উপর ফি ৪। জনকল্যাণ সহায়ক কাজের অর্থ সংগ্রহের জন্য এলাকার প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের উপর কর, ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত

জনস্বার্থে বিশেষ কল্যাণ কাজে ফি। এ পরিবর্তনের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের আয় বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং জাতীয় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়।

৭.০ স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন-১৯৮৮

৭.১ ১৯৮৮ সালের ৪ঠা জুন তারিখে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইনটি বলবৎ হবার পরে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী একটি করে জেলা পরিষদ স্থাপিত হয় এবং সংশ্লিস্ট জেলার নামে জেলা পরিষদটি পরিচালিত হবে বলে উল্লিখিত হয়। এই আইন পাশ হবার আগে পূর্ববর্তী আইন অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ এর ৯৭ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী পূর্বতন ২২টি জেলায় জেলা প্রশাসক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করতেন। এই আইন প্রণীত হবার পরে জেলা পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মর্যাদা পায়। জেলা পরিষদের স্থানীয় ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে এবং এই আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে স্থাবর এবং অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার ও অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে এবং পরিষদের নামে মামলা দায়ের করতে পারবে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে। প্রতিনিধি সদস্য, মনোনীত সদস্য, মহিলা সদস্য ও কর্মকর্তা সদস্য সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয়। জেলার সংসদ সদস্যগণ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভাসমূহের চেয়ারম্যানগণকে পদাধিকারবলে জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য করার বিধান এ আইনে রাখা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, জেলা পরিষদের কর্মকর্তা সদস্যদের ভোট প্রদানের ক্ষমতা ছিলনা।

৭.২ এই আইনের প্রথম তফসীলের বিধান মোতাবেক জেলা পরিষদের দুই ধরনের কার্যাবলী সম্পাদনের ব্যবস্থা রাখা হয়; যেমন ঃ ১। আবশ্যিক ও ২। ঐচ্ছিক। আবশ্যিক কার্যাবলীর ১২টি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। যেমন জেলার মধ্যে সকল উন্নয়ন উদ্যোগ এর পুনরীক্ষণ, উপজেলাকে সহায়তা, সহযোগিতা-উৎসাহ প্রদান এবং উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষা, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভাসমূহ বা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নয় এই রকমের জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজের নির্মাণ, সরাইখানা নির্মাণ, ডাকবাংলো, বিশ্রামাগার, উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলী সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের সংগে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। আর ঐচ্ছিক কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে-শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, অর্থনৈতিক ও জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় এলাকা ও এলাকাবাসীদের ধর্মীয় নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো এই যে জেলা পরিষদ তার তহবিলের সংগতির উপরে ভিত্তি করে সরকারী নির্দেশ বা সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী আবশ্যিক কার্যাবলী সম্পাদন করবে। আর ইচ্ছে

করলে বা সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী জেলা পরিষদ ঐচ্ছিক কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারবে। তাছাড়া সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে জেলা পরিষদ যে কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রম বা প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করতে পারে। তবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান, তহবিলের উপরে দায়যুক্ত ব্যয়, দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে নির্দেশ দেয়া হয়।

৭.৩ দ্বিতীয় তফসিলের বর্ণনানুযায়ী জেলা পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে ৮টি উৎস থেকে নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে: (১) স্থাবর সম্পত্তির উপরে ধার্য করের অংশ, (২) বিজ্ঞাপনের উপরে কর (৩) জেলা পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পূল ও ফেরীর উপরে টোল (৪) জেলা পরিষদ স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস, (৫) জেলা পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রেট (৬) জেলা পরিষদ কর্তৃক কৃত জনকল্যাণমুলক কাজ থেকে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের জন্য ফিস (৭) জেলা পরিষদ কর্তৃক কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস এবং (৮) সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আরোপিত কোন কর।

৭.৪ এই আইন বলে জেলা পরিষদের একজন করে সরকার মনোনীত চেয়ারম্যান (যিনি সাধারণভাবে ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য) নিয়োগদানের বিধান রাখা হয়। এই আইন বলে একবার চেয়ারম্যান মনোনয়ন দেয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে একটি সংশোধনী আদেশ জারী করে চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হয়েছে। আর সার্বিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য একজন জ্যৈষ্ঠ সিনিয়র সহকারী সচিবকে জেলা পরিষদের সচিব নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য এই ব্যবস্থা তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে মোট ৬১টি জেলায় প্রবর্তিত হয়।

৮.০ রাংগামাটি/বান্দরবন/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন -১৯৮৯

স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন ১৯৮৮ অনুযায়ী বাংলাদেশের ৬১টি জেলা পরিষদ গঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু রাংগামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি এ তিনটি পার্বত্য জেলায় জেলা পরিষদের পরিবর্তে জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা যথাক্রমে রাংগামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৮ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ এ তিনটি পার্বত্য জেলার জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার পরিষদ পৃথক তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে।

৯.০ পল্লী পরিষদ আইন-১৯৮৯

পল্লী অঞ্চলে স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা লক্ষ্যে আইনটি পাশ হয়েছিল। কিন্তু এই আইনটি যেহেতু অনেকটা রাজনৈতিক প্রকৃতির ছিল তাই তৎকালীন সরকার পতনের ফলে বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারেনি।

১০.০ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) আইন-১৯৯৩

১৯৯৩ সালের ২২শে জুলাই এ আইনটি প্রণীত হয়। যা স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করে। এই আইন বলে নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং তিনটি ওয়ার্ডের নয়জন (প্রতি ওয়ার্ডে তিনজন) নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করার বিধান কার্যকর হয়। এই আইন বলে মহিলা সদস্যদের জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তিনটি করে আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান রাখা হয়। এই আইন বলে ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পষিদ) অধ্যাদেশের ১৮ ধারার পরিবর্তন করে বলা হয় যে, ইউনিয়ন পষিদের সদস্যদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে (মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি ছাড়া) সমগ্র ইউনিয়ন এলাকাকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করতে হবে। এ আইন বলে ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশে উল্লিখিত উপজেলা পরিষদ শব্দের পরিবর্তে থানা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদ অথবা থানা পরিষদ, যেটা প্রযোজ্য হয়-এ শব্দ ও কমাগুলির পরিবর্তে থানা নির্বাহী অফিসার শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশের ৫১নং ধারা এবং প্রথম তফসীলের সংশোধন আনয়ন করে উপজেলা পরিষদ অথবা থানা পরিষদ শব্দগুলির পরিবর্তে জেলা প্রশাসক শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে ৬টি খাতকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখকরণঃ

১। বসতবাড়ীর ইউনিয়ন কর আদায় ২। ব্যবসা বাণিজ্য এবং ফেরীওয়ালাদের উপরে কর ধার্য্যকরণ ৩। সিনেমা নাটক, থিয়েটার এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদির উপর কর ধার্যকরণ ৪। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং পারমিটের উপর ফি ৫। ইউনিয়নের সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত সুনির্দিষ্ট হাট-বাজার এবং ফেরীর উপরে কর ধার্যকরণ (উল্লেখযোগ্য যে, হাট-বাজার ও ফেরীঘাট এর উপর কর, ইজারা প্রদত্ত অর্থ ধার্যের বিষয়টি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হতে হবে) ৬। ইউনিয়ন সীমারেখার মধ্যে সামগ্রিকভাবে অবস্থিত জলমহলগুলির (যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত) উপরে কর (ইজারা প্রদত্ত অর্থ)।

১১.০ এ আলোচনায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক অর্থাৎ পৌর-সভার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি। অথচ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশের সুচনালগ্নে সর্ব প্রথম পৌরসভার বিকাশ ঘটানো হয়। ১৮৫৬ সালে এ উপমহাদেশের প্রথম পৌরসভা নাসিরাবাদে স্থাপিত হয়েছিল। পৌরসভা ব্যবস্থার যথাযথ বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে ১৮৮৩ সালে মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়।

১৯৩২ সালে দি বেংগল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট প্রণীত হয়। ১৯৬০ সালে দি মিউনিসিপ্যাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স প্রণীত হয়। ১৯৭৭ সালে দি পৌরসভা অর্ডিন্যান্স প্রণীত হয়। ১৯৮২ সালে দি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অর্ডিন্যান্স

প্রণীত হয়। ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স এবং খুলনা মিউনিসিপ্যাল অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪ সালে প্রণীত হয়।

পৌরসভাগুলি সাধারণত ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য তিনজন নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনার নিয়ে গঠিত হয়। তাছাড়া ৩ জন করে মহিলা সদস্য থাকেন প্রতিটি পৌরসভায়। বাংলাদেশে বর্তমানে ১২৬টি পৌরসভা আছে। তার মধ্যে প্রায় ৫০টি পৌরসভা ইউনিয়ন পরিষদের মতো, ৩টি ওয়ার্ডে বিভক্ত এবং প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ৩ জন কমিশনার নির্বাচিত হন। বাদবাকী পৌরসভাতে জনসংখ্যা ও আয়তনের ভিত্তিতে ওয়ার্ড কমিশনারের সংখ্যার তারতম্য ঘটে ওয়ার্ডের সংখ্যার তারতম্য অনুযায়ী।

১১.২ পৌরসভা অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী প্রতিটি পৌরসভার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়। এসব কাজের মধ্যে আছে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য, নর্দমা নির্মাণ, নগর উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ, খেলার মাঠ ও উদ্যান সংরক্ষণ, সমাজ উন্নয়ন, ইত্যাদি। আর ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী শহরের জন্য বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। এসব সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হিসেবে একজন মেয়র জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। আয়তন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিশনার নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

১১.৩ পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের আয়ের উৎস হলো গৃহ এবং জমির উপরে কর ও সম্পত্তি হস্তান্তরের উপরে কর, যানবাহন কর, পেশা ও বৃত্তির উপরে কর ইত্যাদি। তাছাড়া পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের রাস্তার বাতির ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ, আবর্জনা অপসারণ ইত্যাদি সার্ভিসের জন্য জনসাধারণের উপরে রেট ধার্য পৌর কর্তৃপক্ষ করে থাকে।

১২.০ উপসংহার

অতীতে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারগুলির অন্যতম দায়িত্ব ছিল গ্রাম পর্যন্ত সরকারী শাসনের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা বা সরকারী শাসনাদর্শ গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত করা। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ধারা অব্যাহত রাখার সাথে সাথে সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন বর্তমানে স্থানীয় সরকারসমূহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। সরকারী বিভিন্ন বিভাগের সাথে সাথে এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করে আসলেও তাদের আর্থিক স্বাধীনতা অথবা সম্পদ না থাকার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতা, প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বের অভাব, উচ্চতর প্রতিষ্ঠান বা সরকারী কর্মকর্তাদের উপর নির্ভরশীলতা, বলিষ্ঠ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও সদ্ব্যবহারের অনীহা, সরকারের সদিচ্ছার অভাব এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার

প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটেনি।

তবে আশার কথা, বর্তমানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন ইউনিয়ন পরিষদকে সরকার শক্তিশালী ও কার্যকর সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিচ্ছে। নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করে ইউনিয়ন পরিষদগুলো যাতে কার্যকর ও সফল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হতে পারে সেজন্য ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ সংশোধনী) আইন ১৯৯৩ জারী করা হয়েছে। এখন প্রয়োজন যোগ্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের, যিনি ইউনিয়ন পরিষদকে একটি কার্যকর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত করে সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করতে পারেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। আনিসুজ্জামান, মোহাম্মদ (সম্পাদিত) *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন*, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮২।

২। ভূইয়া, মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ, *লোক প্রশাসনের রূপরেখা*, ঢাকা বুক হাউজ, ১৯৭৯।

৩। হক, আবুল ফজল , *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।

4. Ali AMM. Showkat. *Field Administration & Rural Development in Bangladesh*, Dhaka. CSS-1982.

5. Ali Shaikh Maqsood etal. *Decentralization and People's Participation in Bangladesh*, Dhaka. NIPA. 198.

6. Dacca University. Department of Political Science. *Politicies and Administration in Bangladesh*, Dhaka. 1980.

7. **Khan. Md. Mohabbat and Zaforullah. Md. Habib (ed) *Rural Development in Bangladesh : Trends and Issues*,** Dacca. Centa. 1981.

8. Rahman. Atiur. *Rural Power Structure : A Study of the Local Level Leader in Bangladesh*, Dhaka. BBI. 1981.

9. Alam. Manjur-ul. *Local Government at work in Rural Bangladesh.* Journal of BARD. Vol-VI. No.2. 1977. PP. 17-25.

10. Islam. Shamsul. *Local Government and National Development Quarterly*, Vol-6c No-3. 1977.

11. Molla. Md. Giasuddin. *New Hopes for Union Parishads : Case of Bangladesh*, Administrative Science Review. Vol-VIII. No-1. 1978. PR 43-47.

12. Rahman M. Lutfur and Das. Nr. *Union parshad Taxes : Nature of payemnt by the farmers.* Administrative Science Review. Nol-X. No. 4. 1980 PP. 17-28.

১৩। আজম, কে. কিউ এবং হোসাইন, আলী আজম, *ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সমস্যা-চেয়ারম্যানবৃন্দ যেভাবে ব্যক্ত করেছেন* **Local Government Quarterly. Vol-8. No-1-4. 1979. PP. 52-57.**

১৪। আলম, জগলুল *গ্রামীণ প্রশাসন ঃ কয়েকটি সমস্যা*, দৈনিক বাংলা, ২০শে জুলাই, ১৯৮২।

১৫। রহমান এ, এইচ মোঃ আমিনুর, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা*, Local Govgenrment Quarterly Vol-7, No-1-4, 1978.

16. Ahmad. J. Minhasudding. *Training Union Parishad Chairmen*, Bogra, RDA, 1980.

17. Alam Manjur-ul; *Leadership Pattern, Problemes and Prospects of Local Government in Rural Bangladesh;* Comilla, BARD, 1976.

18. Tepper. E. L., (1976) *The Administration of Rural Reform : Structural Constraints and Political Dilemmas, in Stevens R. D. et* al (eds) *Rural Development in Bangladesh and Pakistan.* Honolulu the university Press of Hawaii, PP29-59.

19. Sobhan. R. (1978) *Basic Democracis, Works Programmes, and Rural Development in East Pakistan*, Dhaka : Bureau of Economic Research.